নোকিয়ার পতন কি অন্য মোবাইল কোম্পানির জন্য হুমকি?

মেহেদী হাসান

প্রযুক্তিজগতের পুরোটাই বর্তমানকে ঘিরে। ভবিষ্যতের হাতছানি থাকলেও সেখানে অতীতের কোনো জায়গা নেই। প্রথম পার্সোনাল কমপিউটার হিসেবে অ্যালটেয়ার ৮৮০০ সে সময়ের প্রযুক্তিপ্রেমীদের মনে ব্যাপক আলোড়ন তুললেও এ প্রজন্মের খুব কম মানুষই অ্যালটেয়ারের নাম শুনেছে। সে তুলনায় ম্যাকবুক শতগুণ পরিচিত নাম। অনেক প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে সময়ের পরিক্রমায়। কিন্তু শুধু এরাই এখন প্রথমসারিতে অবস্থান করছে, যারা মানুষের এ পরিবর্তিত চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে নতুন প্রযুক্তি উপহার দিয়ে আসছে। যারা ব্যর্থ হয়েছে, মানুষ তাদের ভুলতে বসেছে। মোবাইল ফোনের বাজারে একটা সময়ে নোকিয়া যে সম্রাট ছিল, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আবার কিছুদিন আগে যে মাইক্রোসফটের কাছে 'নামমাত্র' মূল্যে নোকিয়ার মোবাইল ডিভিশন বিক্রি হয়েছে, তাও সবারই জানা আছে। নোকিয়ার এ পরিণতির পেছনেও আছে সেই একই কারণ, দ্রুত নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে ব্যর্থতা।

যারা নোকিয়ার ভেতরের খবর রাখেন, তারা জানেন নোকিয়ার এ পরিণতি কোনো কালো জাদুর প্রভাবে রাতারাতি হয়নি। বরং দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিষ্ঠানটি লাভের দেখা পাচ্ছে না। নিম্নমুখী আয়ের ধারা অনেক আগে শুরু হলেও লোকসানের শুরু ২০১১ সালে। ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা যাক। ২০০৭ সালে নোকিয়ার মুনাফার পরিমাণ ছিল ৮২০ কোটি ইউরো, ৪০.২৪ শতাংশ কমে ২০০৮ সালে তা দাঁড়ায় ৪৯০ কোটি ইউরোতে। ২০০৯ সালে অবস্থার আরও অবনতি হলেও ২০১০ সালে আগের বছরের তুলনায় কিছুটা অগ্রগতি দেখা যায়। এই দুই বছরে মুনাফা ছিল যথাক্রমে ৯০ কোটি ও ১৭০ কোটি ইউরো। শেয়ারহোল্ডারদের সব আশার আলো নিভিয়ে ২০১১ সালে নোকিয়া ১২০ কোটি ইউরো লোকসান করে বসে। পরের বছর সেই লোকসানের পরিমাণ ২৬০ কোটি ইউরোতে গিয়ে দাঁড়ায়। শেষ তথ্য পাওয়া পর্যন্ত গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে পরিমাণে কম হলেও নোকিয়ার লোকসানের ধারা অব্যাহত রয়েছে। নোকিয়ার প্রকাশিত সর্বশেষ আয়ের বিবরণী অনুসারে ২০১৩ সালের প্রথম অর্ধাংশে (জানুয়ারি থেকে জুন) লোকসানের পরিমাণ ছিল ০.২৬৫ বিলিয়ন ইউরো।

শুধু তাই নয়, দিন দিন নোকিয়ার মোবাইল ফোন বিক্রিও কমে যাচ্ছে। গত বছরের সাথে তুলনা করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়। চলতি বছরের প্রথমার্ধে নোকিয়া ১২ কোটি ৩০ লাখ ইউনিট মোবাইল ডিভাইস বিক্রি করে, যার মাঝে ১ কোটি ৩৫ লাখ ইউনিট স্মার্টফোন। গত বছরের প্রথমার্ধে নোকিয়া ২ কোটি ২১ লাখ ইউনিট স্মার্টফোনসহ মোট ১৬ কোটি ৬৪ লাখ ইউনিট মোবাইল ডিভাইস বিক্রি করেছিল, যা চলতি বছরের তুলনায় ৩৫.২৮ শতাংশ বেশি। আর্থিক হিসাবে দেখলে, চলতি বছরের প্রথমার্ধে নোকিয়া ৫৬১ কোটি ইউরো মূল্যমানের মোবাইল ডিভাইস বিক্রি করে, যা আগের বছরের প্রথমার্ধে ছিল ৮২৭ কোটি ইউরো। এখন পাঠকদের কাছে প্রশ্ন, মাইক্রোসফটের কাছে নোকিয়ার বিক্রি কি খুব অযৌক্তিক? কিংবা লোকসানে পর্যবসিত একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য মাইক্রোসফটের খরচ করা ৫৪৪ কোটি ইউরো কি খুব কম? মোটেই নয়। মাইক্রোসফট কিংবা নোকিয়ার নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্তে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

আগেই বলা হয়েছে এই লোকসান, এই বাজার হারানোর পেছনে মূল কারণ বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা। এ পরিণতি শুধু নোকিয়ার নয়, এর আগে আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের কপালে জুটেছে। বাজারে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলোর এখন উচিত শিক্ষা নেয়া এবং সেই শিক্ষাকে পথচলার সঙ্গী করে নেয়া। নইলে অ্যাপল বলুন আর স্যামসাং বলুন, ভাগ্যে জুটবে শুধুই ব্যর্থতা। একটু পেছনে ফিরে তাকালেই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। নব্বই দশকে নোকিয়া বাজার দখলের জন্য বেশ চেষ্টা করলেও ২০০০-এর আগে সেটা কপালে জোটেনি। কারণ, সে সময়ে মোবাইল ফোনের বাজার দখলে ছিল মটোরোলার। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মোবাইলের মতো ছোট বহনযোগ্য ডিভাইসে তা সংযোজনে মটোরোলার কোনো জুড়ি ছিল না। সে সময়ে শেয়ারবাজারে কোম্পানিটির শেয়ার চড়া দামে বিক্রি হয়ে এসেছে। মটোরোলার ব্যবস্থাপনা পরিষদের প্রশংসায় তখন প্রযুক্তিজগত পঞ্চমুখ। কিন্তু অবস্থা পাল্টাতে খুব বেশি সময় লাগেনি। তখন ছিল নোকিয়ার উত্থানের সময়। মোবাইল ফোন বাজারের ৪৫ শতাংশ দখল নিয়ে মটোরোলা রীতিমতো সম্রাট বনে গিয়েছিল। সেই ৪৫ শতাংশ পরে ১৫ শতাংশে নেমে এসেছিল, যখন নোকিয়া বাজারের ৩১ শতাংশের দখল নিয়ে নেয়। মটোরোলার আধিপত্যের যুগের সমাপ্তি সেখানেই। এদিকে 'কানেক্টিং পিপল' স্লোগান নিয়ে নোকিয়া তখন অপ্রতিরোধ্য। নোকিয়ার তখনকার পদক্ষেপগুলো ছিল সত্যি অসাধারণ। দ্বিতীয় প্রজন্মের নেটওয়ার্ক অর্থাৎ টুজি চালু হওয়ার পরপরই নোকিয়া তা গ্রহণ করেছে। নোকিয়া প্রথম মোবাইল ডিভাইস প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান যে একই সাথে অধিক আয় ও স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য মোবাইল ফোন বাজারে ছেড়েছে। এমনকি স্মার্টফোনের উদ্ভাবনের সাথেও জড়িয়ে আছে নোকিয়ার নাম। উপরন্তু নোকিয়ার ডিভাইসগুলোর চমৎকার ডিজাইন, সহজে ব্যবহারযোগ্যতা ও গুণগত মান জনমনে দ্রুত আবেদন তুলতে সাহায্য করেছে। নোকিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল একটি অনন্য ব্র্যান্ড তৈরি। নোকিয়া সবকিছুই সমানতালে চালিয়ে গেছে। অপরদিকে মটোরোলা তাদের ব্র্যান্ড তৈরি ও ডিজাইনে এত বেশি মনোযোগী ছিল যে, ডিজিটাল ধারার কথা মাথায় আনেনি। ফলস্বরূপ তাদেরকে একের পর এক প্রকল্প বাতিল করতে হয়েছে, প্রচুর লোকসান হয়েছে, কর্মী ছাঁটাই করতে হয়েছে, সর্বোপরি এরা পিছিয়ে পড়ে ও ঘুরে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পরবর্তী সময়ে এরা বাজারে ফিরে এলেও আগের জৌলুস আর ফিরে পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নোকিয়াও প্রায় একইভাবে বাজার হারাতে শুরু করে। ২০০০ সালের পরের সময়ের ঘটনা। বাজারে তখন মোবাইল ইন্টারনেট চালু হয়েছে। নোকিয়া এই প্রযুক্তি কাজে লাগাতে অনেক সময় নিয়েছে। এদিকে ২০০১ সালে অ্যাপল চালু করে আইটিউনসের মতো যুগান্তকারী ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা, যেখানে অ্যাপল ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিনামূল্যে গান শুনতে ও ডাউনলোড করতে পারে। আইফোন চালু হওয়ার ছয় বছর আগের ঘটনা। আপাতদৃষ্টিতে তাই নোকিয়ার জন্য সেটা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনে না হলেও আইটিউনসের ধারণা জনমনে ব্যাপক সাড়া জাগায়। ২০০৪ সালে নোকিয়ার মোবাইল ফোনের জন্য একটি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন স্টোর তৈরির প্রস্তাব এলেও দূরদর্শিতার অভাবে তা নাকচ করে দেয়া হয়। এদিকে ২০০৭ সালে অ্যাপল বাজারজাত করে আইফোন। নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন ছিল সেটা। নোকিয়ার ভুলের পুনরাবৃত্তি এরা করেনি, ২০০৮ সালে এরা চালু করে আইস্টোর নামের অ্যাপ্লিকেশন স্টোর। অ্যাপলের আইফোন নোকিয়ার আধিপত্যের ভিত নাড়া দেয়, স্মার্টফোনের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এরা। এদিকে স্মার্টফোনের জন্য অ্যান্ড্রয়িড অপারেটিং ▸

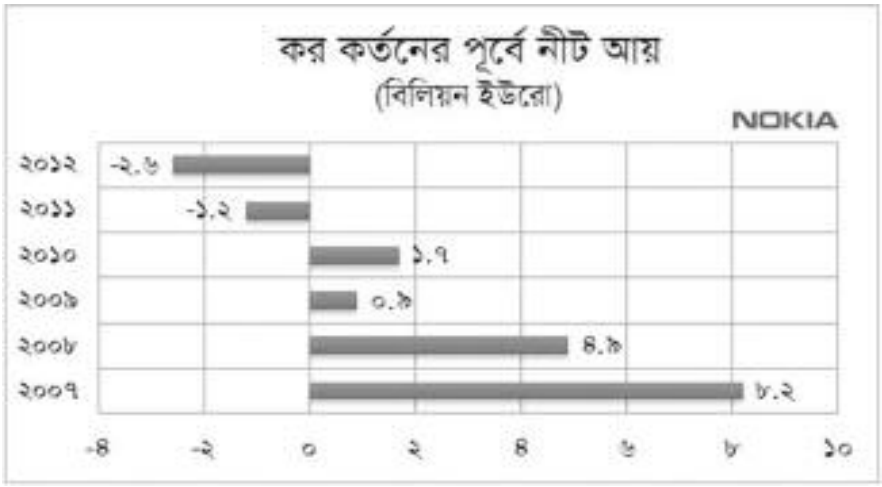

সিস্টেম প্রকাশ করে গুগল। সহজে ব্যবহারযোগ্যতা তো ছিলই, সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও প্রফেশনাল ডেভেলপারের তৈরি লাখ লাখ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের সমন্বয়ে অ্যাপ স্টোর। আন্ড্রয়িড অপারেটিং সিস্টেম ও এর অ্যাপ স্টোর তৈরি থেকে শুরু করে রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন সংস্করণ প্রকাশ পর্যন্ত সবকিছুর দায়িত্বে ছিল গুগল। স্মার্টফোন নির্মাতাদের এ নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হতো না। সবচেয়ে বড় কথা, অ্যান্ড্রয়িড পাওয়া যায় একদম বিনামূল্যে। ফলে স্মার্টফোন নির্মাতাদের কাছে অ্যান্ড্রয়িড হয়ে ওঠে আদর্শ। এ সুযোগটা নিতে একটুও দেরি করেনি স্যামসাং। ২০১০ সালে এরা বাজারে ছাড়ে গ্যালাক্সি এসের মতো স্মার্টফোন। নোকিয়ার কফিনে সেটি ছিল আরেকটি পেরেক ঠোকার মতো। অ্যান্ড্রয়িড অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে স্যামসাং এত দ্রুত ও বেশি এগিয়ে যায় যে, নোকিয়ার পক্ষে স্যামসাংকে টপকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। আর তাই নোকিয়া অ্যান্ড্রয়িডের দিকে পা বাড়ায়নি। মূলত সেটিও ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত। নোকিয়ার দুরবস্থার আরেকটি কারণ, এরা ইউরোপ ও এশিয়ার বাজার দখলে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে উত্তর আমেরিকায় বাজার তাদের কাছে উপেক্ষিত থেকে যায়। ফলে ফিচার ফোনের তুলনায় স্মার্টফোনের বিক্রি দ্রুত কমে যায়। অথচ নোকিয়ার সে সময় মুনাফা বাড়ানো সবচেয়ে জরুরি ছিল। নোকিয়া যে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেনি, তা নয়। ২০০৯ সালে এরা অভি স্টোর চালু করে অ্যাপলের আইটিউনসের সাথে টক্কর দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। বাজার ফিরে পাওয়ার জন্য নোকিয়া গবেষণা ও উন্নয়নে প্রচুর ব্যয় করে। কিন্তু ততদিনে লোকসানে এতটাই জর্জরিত হয়ে পড়েছে যে, তা তাদের দুর্গতি বাড়িয়েছে, কোনো ফল দেয়নি। ফিরে দাঁড়াবার সর্বশেষ চেষ্টা হিসেবে সিমবিয়ান ছেড়ে এরা মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ফোন অপারেটিং সিস্টেম আঁকড়ে ধরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাওয়ায় নোকিয়ার কোনো চেষ্টাই ফলপ্রসূ হয়নি। একসময় যেমন মটোরোলার সাম্রাজ্য গুটিয়ে গেছে, চলতি সময়ের আলোচনার বিষয় মোবাইল ফোন বাজারের আরেক সম্রাটের পতনের।

এখন প্রশ্ন হলো, এভাবে একের পর এক মোবাইল ফোন বাজারের প্রধান খেলোয়াড়দের পতন বর্তমানের প্রথম সারির প্রস্তুতকারকদের জন্য হুমকি কি না। দুটি উত্তর– হ্যাঁ ও না। আমাদের উত্তর বিশ্লেষণের আগে দেখা যাক মোবাইল ফোন বাজারের বর্তমান অবস্থা। যেহেতু ভবিষ্যতের মোবাইল ফোন বাজার নির্ধারিত হবে স্মার্টফোনের ওপর ভিত্তি করে, তাই আমরা মূলত স্মার্টফোনের ওপরেই গুরুত্ব দেব। ফিচার ফোনের দিকে পা বাড়িয়ে আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করব না। ইন্টারন্যাশনাল ডাটা কর্পোরেশনের (আইডিসি) তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের দ্বিতীয়-চতুর্থাংশ অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সর্বমোট ৪৩.২১ কোটি ইউনিট মোবাইল ফোন বাজারাজত করা হয়, যা আগের বছরের দ্বিতীয়-চতুর্থাংশের চেয়ে ৬ শতাংশ বেশি। এর মাঝে স্মার্টফোনের পরিমাণ ২৩.৭৯ কোটি, যা আগের বছরের একই মেয়াদে বাজারজাত করা স্মার্টফোনের চেয়ে ৫২.৩ শতাংশ বেশি। এ থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট বলা যায়: এক. বর্তমানে ফিচার ফোনের তুলনায় স্মার্টফোন বেশি বাজারজাত করা হয়। দুই. ফিচার ফোনের তুলনায় স্মার্টফোনের বাজার দ্রুত বাড়ছে। স্মার্টফোনের বাজার তৈরিতে অবদান বেশি অ্যাপলের। ২০০৭ সালে এদের আইফোন এই ভূমিকা নিয়েছে। তবে বিশ্ববাজারে বর্তমানে স্যামসাং তাদের গ্যালাক্সি সিরিজ নিয়ে আধিপত্য বজায় রেখেছে। আইডিসির দেয়া তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের দ্বিতীয়-চতুর্থাংশে স্মার্টফোন বাজারের ৩০.৪ শতাংশ ও ১৩.১ শতাংশ দখল ছিল যথাক্রমে স্যামসাং ও অ্যাপলের হাতে। আগের বছরের একই সময়ে স্যামসাংয়ের দখলে ছিল বাজারের ৩২.২ শতাংশ ও অ্যাপলের দখলে ছিল ১৬.৬ শতাংশ। এ দুই জায়ান্ট কোম্পানি বাদ দিলে ৫৬.৪ শতাংশের দখল বাজারের অন্য স্মার্টফোন নির্মাতাদের হাতে, যা আগের বছরের দ্বিতীয়-চতুর্থাংশে ছিল ৫১.১ শতাংশ। পরিসংখ্যানের তথ্যগুলোর দিকে নজর দিলেই একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যায়, স্যামসাং কিংবা অ্যাপল, উভয়ের বাজারের দখল আগের বছরের তুলনায় নিম্নমুখী। সে তুলনায় এ দুটি কোম্পানি ছাড়া বাজারের অন্য কোম্পানিগুলোর স্থান উর্ধ্বমুখী। এই অন্য কোম্পানিগুলোর মধ্যে এলজি, লেনোভো, জেডটিই ও এইচটিসি প্রধান। এর অর্থ, স্মার্টফোনের বাজার দখলে নিতে সব কোম্পানি আদাজল খেয়ে লেগেছে।

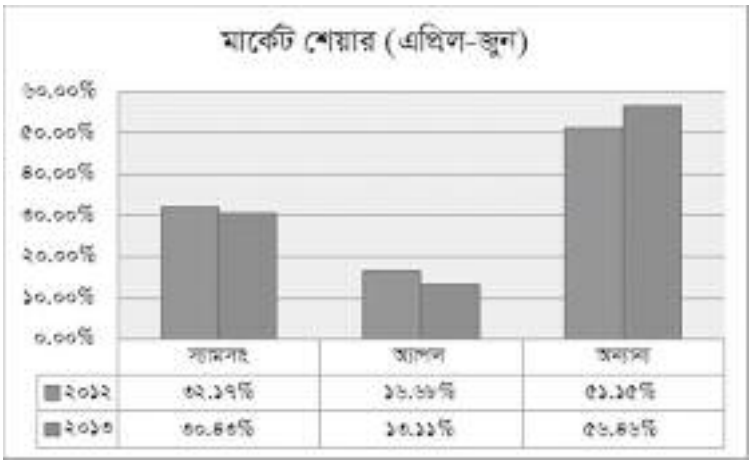

তবে অ্যাপল কিংবা স্যামসাংয়ের জন্য এখনই এটা কোনো হুমকি নয়। কারণ, এরা উৎপাদন বাড়িয়েই চলেছে ও বাজারে এদের পণ্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। তবে অপেক্ষাকৃত ছোট কোম্পানিগুলোর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠাটা বড় কোম্পানিগুলোর জন্য অবশ্যই মাথাব্যথার কারণ, বিশেষ করে অ্যাপলের জন্য। স্মার্টফোনের 'স্মার্ট' হয়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে বেশি যা কাজ করে তা এর অপারেটিং সিস্টেম। আর অপারেটিং সিস্টেমের ভিত্তিতে ভাগ করতে গেলে সব স্মার্টফোনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় : অ্যাপলের আইওএস, গুগলের অ্যান্ড্রয়িড এবং এই দুটি ছাড়া বাকি মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম। আইওএস অ্যাপলের মালিকানাধীন সফটওয়্যার শুধু অ্যাপলের পণ্যেই ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে অ্যান্ড্রয়িড বিনামূল্যের সফটওয়্যার। যেকোনো প্রস্তুতকারী তা ব্যবহার করতে পারে। তবে উন্নয়নের দায়িত্বে রয়েছে গুগল। একক অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে আইওএসের ছিল একক আধিপত্য। সেই আধিপত্য এখন অ্যান্ড্রয়িডের দখলে। শুধু তাই নয়, অ্যাপলের দুর্গ হিসেবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রেও আধিপত্য দখলে হানা দিয়েছে অ্যান্ড্রয়িড। এ দুই ওএস ছাড়া বাকিগুলোর মধ্যে রয়েছে উইন্ডোজ ফোন ও সিমবিয়ান। উইন্ডোজ ফোনের বাজার উঠতির দিকে হলেও সিমবিয়ানের বাজার পতনমুখী। অ্যাপলের ব্র্যান্ড লয়ালটি এখন আকাশছোঁয়া। এ ব্র্যান্ড একসময় কমপিউটার জগতে আইবিএম ও মাইক্রোসফটের মতো টেক জায়ান্টদের টক্কর দিয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এখন চ্যালেঞ্জটা আসছে গুগলের কাছ থেকে। আর গুগল তার প্রযুক্তিগত পরিবেশ সম্পর্কে সবসময় সতর্ক। পরিস্থিতির পরিবর্তন শুধু সময়ের ব্যাপার। বাজারে টিকে থাকতে হলে অ্যাপলকে প্রতিযোগিতামূলক দাম ও সে অনুযায়ী ফিচার যোগ করতে হবে। কিন্তু সদ্য বাজারজাত করা আইফোন ৫এস ও আইফোন ৫সি নিয়ে অনেকেই হতাশা প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে অ্যাপ্লিকেশন স্টোরের কথা বিবেচনা করি। আইস্টোরে বিক্রি করা প্রতিটি অ্যাপের বিক্রয়মূল্য হতে অ্যাপল ৩০ শতাংশ কেটে রাখে, যেখানে গুগলের প্লে স্টোরে এ পরিমাণ ১০ শতাংশ। থার্ড পার্টি অ্যাপস্টোরে বিক্রি করা অ্যাপ ও সেসব অ্যাপের অফার অ্যাপল আইস্টোরে প্রকাশ করার অধিকার রাখে। কিন্তু অ্যান্ড্রয়িডে সে ধরনের কোনো শর্ত নেই। ব্যবহারকারী সংক্রান্ত কোনো তথ্য অ্যাপল অ্যাপ ডেভেলপারদের সরবরাহ করে না। কোনো অ্যাপের উন্নয়নের জন্য এসব তথ্য খুবই জরুরি, যা গুগল তাদের ডেভেলপারদের সরবরাহ করে। অর্থাৎ আইস্টোরের ডেভেলপারেরা নাখোশ। এমন অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই এরা অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যবহারকারীর প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড্রয়িডের জন্য অ্যাপ তৈরিতে আগ্রহী হবে। অ্যাপলের জন্য এটি অবশ্যই চিন্তার ব্যাপার।

মধ্য ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য এখন পর্যন্ত অ্যাপল কোনো স্মার্টফোন বাজারে ছাড়েনি। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, এটাও অ্যাপলের জন্য খারাপ দিক। সব মিলিয়ে বলা যায়, অ্যাপলের স্মার্টফোন ডিভিশনের পরিণতিও নোকিয়ার মতো হবে, যদি এখনই কোনো ব্যবস্থা না নেয়া হয়। অন্যদিকে স্যামসাংয়ের দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। তবে এদেরও উচিত প্রযুক্তিপ্রেমীদের চাহিদার কথা মাথায় রাখা। মাইক্রোসফটের অঙ্গসংস্থা হিসেবে নোকিয়া বাজারে নিজের অবস্থান ফিরে পাবে কি না, এটাও এখন দেখার বিষয়। সর্বোপরি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও জোগানের সমন্বয়ই কাম্য। এর অন্যথা বিপর্যয়ের নামান্তর কজ

ফিডব্যাক : m_hasan@ovi.com